OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 243 - 254
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 243 - 254
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শশাঙ্ক’ : ইতিহাস বনাম আখ্যায়িকা

দেবপ্রিয়া দাস
গবেষক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : dasdebapriya97@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Shashanka, Hiuen Tsang, Banabhatta, Buddhist Monk, Buddhist Sangha, Brahmin, Anti Buddhist, Royal Patronage, Nationalist.

Abstract
In his narrative Shashanka, Rakhaldas Bandyopadhyay sought to rekindle the spirit of a humiliated and oppressed Indian populace by portraying the independent Bengal of the 7th century against the backdrop of 19th and 20th-century colonial India. At that time, the extraordinary valor of the Sikhs, Marathas, and Rajputs was well known throughout the country. Yet, instead of choosing any of these non-Bengali figures as his hero, Rakhaldas presented Shashanka, the ancient sovereign ruler of Bengal, who had liberated Gauda - present-day Bangladesh - from the shackles of subjugation.

Bandyopadhyay's narrative constructs a powerful dichotomy between freedom and subjugation, strength and weakness, through which he explores the conflict between Hinduism and Buddhism in 7th-century India. One of the most contentious questions in history is: was Shashanka truly anti-Buddhist? History has often portrayed Shashanka through a one-sided lens, resulting in a simplistic evaluation of his character. Rakhaldas Bandyopadhyay, however, diverged from this conventional historical narrative in his Shashanka, attempting instead to offer a more nuanced view.

By presenting the actions and motivations of both Shashanka and the Buddhist monks, he created space for a re-evaluation of Shashanka's character. Many of the allegations against Shashanka appear, in Rakhaldas's portrayal, to be exaggerated. Hence, he provides counter-arguments to defend Shashanka and absolve him of such accusations. Conversely, he casts doubt on the conduct and ideals of the Buddhist monks by portraying them in a tainted, morally ambiguous light.

In those of Rakhaldas Bandyopadhyay's novels that depict the socio-cultural fabric of the Hindu-Buddhist era, the Buddhist monks are often shown in a degenerate and decayed form. As a novelist, he fails to maintain an impartial perspective in this regard. His portrayal of Buddhist monks reflects a nationalist sentiment, rooted in his ideological convictions. Consequently, Shashanka is presented as the epitome of masculine prowess. Through the

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 243 - 254
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

heroic tale of this Hindu patriarch and his immense strength, there is a discernible and conscious attempt to assert Hindu national pride.

Discussion

বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের বহুমুখী দিক উন্মোচন করার ক্ষেত্রে অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি হলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি একাধারে ছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক। প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসের পাঠ শেষ করে তিনি একদিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাছে সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ে খুটিনাটি পাঠ গ্রহণ করেন এবং অন্যদিকে, থিয়োডোর ব্লখের তালিমে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন এবং শিলালিপি উদ্ধারের কাজে নিমগ্ন হন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা তাঁকে সাহিত্য সৃষ্টি ও ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রেরণা জুগিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় ও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হবে। কারণ, একদিকে জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়ে সহকর্মীদের চক্রান্তের শিকার হয়ে তাঁকে কর্মক্ষেত্র থেকে অপসারিত হতে হয়, অন্যদিকে বেশিরভাগ বাঙালি তাঁর আবিষ্কার, সত্যানুরাগ ও ইতিহাসনিষ্ঠা সম্পর্কে অবগত নন কিংবা উদাসীন। তথাপি, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, একাধিক প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং বিশেষভাবে উল্লেখ্য 'বাঙ্গালার ইতিহাস' এর প্রথম (১৩২১) ও দ্বিতীয় ভাগ (১৩২৪)-এ যেভাবে তিনি যুক্তি, তর্ক এবং তথ্য উপস্থাপন করেছেন, তার মাধ্যমে আত্মবিস্মৃত বাঙালি জাতিকে তাঁর শিকড়ের সঙ্গে পরিচিত করার চিরন্তন রসদ তিনি দান করেছেন। তবে, আমাদের দেশের ইতিহাসকে নতুন ভাবে জানা কিংবা বোঝার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক উপাদানের অপ্রতুলতার কারণে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আক্ষেপের সঙ্গে জানিয়েছেন -

> "যে দেশে শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রাচীনমুদ্রা ও সাহিত্যে লিপিবদ্ধ জনপ্রবাদ ব্যতীত ইতিহাস রচনার অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য উপাদান আবিস্কৃত হয় নাই, সে দেশে ইতিহাসের কঙ্কাল ব্যতীত অন্য কিছু আশা করা যাইতে পারে না।"[১]

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের এই কঙ্কালের ওপর রক্ত-মাংসের সন্নিবেশ ঘটিয়ে পূর্ণাবয়ব দান করার কাজে একান্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস রচনার মাধ্যমে।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখের কলমের মাধ্যমে আমাদের একাধিক ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসের সাথে পরিচিতি ঘটে। কিন্তু এগুলোর বেশিরভাগ প্রায় মুসলমান বিজয়ের পরবর্তীকালের ইতিহাস। এই উপন্যাসগুলিতে দেশের অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করার মাধ্যমে দেশবাসীর চৈতন্যের স্ফূরণ ঘটানোর এক সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে, আইকন হিসেবে ব্যবহার করা হয় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত কোনো বীর চরত্রিকে। যাঁদের শৌর্য, বীরত্ব ও পরাক্রমশীলতার জয়গাথা দেশবাসীর মনে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করে জাতীয়তাবাদী চেতনায় পুনরুজ্জীবিত করবে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ধারার অনুসরণ করে ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বীর চরিত্র চিত্রনের মাধ্যমে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর 'শশাঙ্ক', 'ধর্মপাল', 'করুণা', 'ময়ুখ' ও 'সমুদ্রগুপ্ত' এর মতো একাধিক উপন্যাসে। আসলে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মেছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগরণের এক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সময়ে। সমকালীন যুগের প্রভাব তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। এই অস্থির সময়ের ঢেউ একদিকে যেমন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে নাড়া দিয়েছিল অন্যদিকে, সময়ের দাবিকে আত্তীকরণ করে তিনি শুরু করেছিলেন সাহিত্যের জয়যাত্রা।

বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক এক চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। শশাঙ্ক সম্পর্কে জানার পুথিগত তথ্যের অন্যতম দুটি উৎস হল -

ক. বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'

এবং খ. হিউয়েন সাং-এর বিবরণ।

ইতিহাসে শশাঙ্ককে খানিকটা নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট শশাঙ্ককে 'গৌড়াধম', 'গৌড়ভুজঙ্গ' বলে অভিহিত করেছেন। বাণভট্ট এবং হিউয়েন সাং খানিকটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই শশাঙ্কের নামে একাধিক

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 243 - 254
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অভিযোগ এনেছেন। এর অন্যতম দুটি কারণ হল - প্রথমত, বাণভট্ট ছিলেন হর্ষবর্ধনের সভাকবি। হর্ষবর্ধন ও শশাঙ্ক পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই, হর্ষবর্ধনের বীরত্বকে মহিমান্বিত করে তোলার কাজ সহজবোধ্য করার জন্য শশাঙ্কের অদৃষ্টে জুটেছে একরাশ অপবাদ। দ্বিতীয়ত, হিউয়েন সাং ছিলেন চীনদেশীয় বৌদ্ধ পর্যটক। অন্যদিকে, শশাঙ্কের পরিচয় বৌদ্ধ বিদ্বেষী রূপে। তাই, শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিরোধিতার কাহিনি রচনা করতে তাঁর গায়ে কালিমা লেপন করতে হিউয়েন সাং দ্বিধাবোধ করেননি। এছাড়াও 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প'-এর বৌদ্ধ লেখক কর্তৃক শশাঙ্ক নিন্দিত হয়েছেন। অর্থাৎ, শশাঙ্ক সম্পর্কে জানার বিশ্বস্ত কোনো তথ্যসূত্রের সন্ধান আমরা পাই না। শশাঙ্কর অদৃষ্টে যতখানি অপবাদ জুটেছে, আদতে এতখানি তাঁর প্রাপ্য কিনা, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচলিত ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে সরে এসে তাঁর 'শশাঙ্ক' আখ্যায়িকায় তাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শশাঙ্ক' আখ্যায়িকায় ইতিহাসের অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণাঙ্গরূপ দানের প্রয়াস করেছেন ঐতিহাসিক সত্য এবং আখ্যানের কল্পনার ভিত্তিতে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার মূলে ছিল ঐতিহাসিক রসে পাঠকচিত্তকে সিক্ত করা, ঐতিহাসিক তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত করা নয়।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শিক্ষাগুরু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উদ্দেশে 'শশাঙ্ক' আখ্যায়িকা উৎসর্গ করেছিলেন। আখ্যায়িকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২১ বঙ্গাব্দে। 'শশাঙ্ক'-এর কিছু অংশ প্রাথমিকভাবে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে পুনর্লিখিত হয়ে ধারাবাহিকভাবে 'মানসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার শশাঙ্কের পরিচয় দানপর্বে উল্লেখ করেছেন, -

> "বাঙালী রাজগণের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নরপতি।"[২]

তবে, শশাঙ্কের বংশ পরিচয় সম্পর্কিত কোনো ঐতিহাসিক তথ্যই সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্রগুপ্ত হওয়ায় অনেকে তাঁকে গুপ্তবংশজাত বলে উল্লেখ করেছেন। যদিও, রমেশচন্দ্র মজুমদার সহ একাধিক ঐতিহাসিক এই মতটি নাকচ করে দিয়েছেন। তবে, শশাঙ্ক যে জীবনের প্রারম্ভিক পর্বে সামন্ত ছিলেন, এ বিষয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং নীহাররঞ্জন রায়ের মতো ঐতিহাসিকেরা সহমত পোষণ করেছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, -

> "শিলালিপিখানি দক্ষিণ মগধে রোহিতাশ্ব দুর্গাভ্যন্তরে (বর্ত্তমানে রোহতসগর) পর্ব্বত গাত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা শশাঙ্কের মুদ্রার ছাঁচ। যখন ইহা খোদিত হইয়াছিল, তখন শশাঙ্ক স্বাধীন রাজা নহেন। এই মুদ্রার উৰ্দ্ধদেশে একটি উপবিষ্ট বৃষের মূর্ত্তি খোদিত আছে এবং তন্নিম্নে "শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেবস্য" উৎকীর্ণ আছে।"[৩]

অর্থাৎ, শিলালিপির মাধ্যমে দুটি বিষয় আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়-

ক. শশাঙ্ক সম্ভবত শৈব ছিলেন বলেই তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রায় বৃষের মূর্তি দেখা যায়।

খ. শশাঙ্ক প্রাথমিকভাবে স্বাধীন রাজা ছিলেন না।

রমেশচন্দ্র মজুমদার শশাঙ্ককে মহাসেনগুপ্তর অধীনে একজন মহাসামন্ত বলেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য আখ্যায়িকায় শশাঙ্ককে গুপ্তবংশের উত্তরাধিকারী ও মহাসেনগুপ্তর পুত্র হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন; যাঁর কাছে গুপ্তকুলতিলক সমুদ্রগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তর জয়গাথা শুনিয়ে গুপ্তবংশের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করার স্বপ্ন এঁকে দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিকেরা মাধবগুপ্তকে মহাসেনগুপ্তর পুত্র বলে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, গুপ্তসাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধীকারী শশাঙ্কের কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভাই হলেন মাধবগুপ্ত। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আখ্যায়িকায়, শশাঙ্কের বংশপরিচয় দানপর্বে ইতিহাসের বিভ্রান্তিকর এবং বিতর্কিত অংশ পরিহার করে সরল ও একমুখী কাহিনিকে গ্রহণ করেছেন। হিউয়েন সাং শশাঙ্ককে 'কর্ণসুবর্ণের অধিপতি' বলে উল্লেখ করেছেন। কর্ণসুবর্ণের বর্তমান অবস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে রাঙামাটি নামক স্থানে। হিউয়েন সাং এর বিবরণ থেকে জানা যায়, শশাঙ্ক ৬০৬ অব্দের পূর্বে সিংহাসনে আরোহন করেন এবং ৬৩৭ অব্দের পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিউয়েন সাং ৬৩৭ থেকে ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কর্ণসুবর্ণে ছিলেন, তার পূর্বেই শশাঙ্ক বিগত হয়েছেন। হিউয়েন সাং এর ভ্রমণের সময় উক্ত অঞ্চলটি সম্ভবত হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। অপরপক্ষে, বাণভট্ট তাঁর 'হর্ষচরিত' এ

শশাঙ্ককে 'গৌড়াধিপতি' বলছেন। অর্থাৎ, মগধ, গৌড় ও রাঢ়দেশ শশাঙ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর এই সাম্রাজ্যেরই একটি অংশ পুনরুদ্ধার করেছিলেন 'পরবর্তী গুপ্ত বংশ' নামক গুপ্ত উপাধিধারী রাজারা। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এই রাজারা উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিম বাংলার কিছু অংশ অধিকার করেছিলেন, যা বাংলাদেশে 'গৌড়' নামে পরিচিত হয়েছিল। মৌখরী বংশের পরাক্রমশালী রাজা ঈষাণবর্মা গৌড়গণকে পরাস্ত করেন বলে জানা যায়। অর্ধ-শতকব্যাপী মৌখরীবংশ ও পরবর্তী গুপ্ত বংশের মধ্যে পারস্পরিক বংশানুক্রমিক বিবাদ অব্যাহত ছিল। এই সংঘর্ষের পাশাপাশি উত্তর তিব্বতি দক্ষিণ চালুক্যরাজের আক্রমণে পরবর্তী গুপ্তরাজাদের শক্তি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়লে শশাঙ্ক গৌড়দেশে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যের পত্তন করেন। অতএব, একথা নিঃসংশয়ে স্বীকার করা যায়, একজন মহাসামন্ত হিসেবে বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্কের আবির্ভাব হলেও পরবর্তীকালে তিনি সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শশাঙ্ক' আখ্যায়িকায় সাত শতকের স্বাধীন বাংলাকে উনিশ ও বিশ শতকের উপনিবেশ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপনের মাধ্যমে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত ভারতবাসীকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে চেয়েছিলেন। তদানীন্তন ভারতবর্ষের শিখ, মারাঠা ও রাজপুত জাতির অমিত পরাক্রমশীলতা সমগ্র দেশবাসীর কাছেই সুবিদিত। রাখালদাস এই সকল অবাঙালি চরিত্রদের বীরগাথার গৌরবোজ্জ্বল কাহিনি নির্বাচন না করে, তাঁর উপন্যাসে নায়ক হিসেবে উপস্থাপন করলেন প্রাচীন বাংলার স্বাধীন শাসক শশাঙ্ককে, যিনি তৎকালীন বাংলাদেশ তথা গৌড়কে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। স্বাধীন বনাম অধীন, প্রবল বনাম দুর্বল এই দ্বন্দ্বের ওপর ভিত্তি করে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য আখ্যায়িকায় সাত শতকের ভারতবর্ষে হিন্দু-বৌদ্ধর সংঘাত বিধৃত করেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাণভট্ট ও হিউয়েন সাঙ উভয়ের নানা মন্তব্য থেকে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মের অন্যতম দুর্বৃত্ত। পরবর্তীতে অনেক ঐতিহাসিক বাণভট্ট ও হিউয়েন সাং এর মন্তব্যকে অতিশয়োক্তি বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আচার্য রিস্ ডেভিডস-ই সর্বপ্রথম বাণভট্ট ও হিউয়েন সাং এর মতামতকে খণ্ডন করেন, -

> "পক্ষান্তরে, শশাঙ্ক যে বৌদ্ধধর্মের দুরন্ত রাহু ছিলেন, তাহাতে জাপানী পণ্ডিত য়ামাকামী সোগেনের কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। পরন্তু তিনি মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে'র বর্ণনার কুমারিল ভট্টের প্ররোচনায় উজ্জয়িনীর জনৈক রাজা সুধন্বা তাঁহার রাজভৃত্যগণকে যে আদেশ দিয়াছিলেন,
>
> আসেতোরাতুষারাদ্রে বৌদ্ধানাং বৃদ্ধাবালকান্।
> যো ন হন্তি সে হন্তব্যো ভৃত্যানিত্যন্বশান্নৃপ্যঃ।।
>
> অর্থাৎ, রামেশ্বর সেতুবন্ধ হইতে হিমালয় পর্যন্ত, বৃদ্ধ হোক্, বালক হোক্, বৌদ্ধ দেখিলেই সংহার করিতে হইবে, এবং ইহা যে না করিবে তাহাকেই হত্যা করা হইবে, - এই আদেশটি কাহার আদেশ এবং কোথায় উল্লিখিত আছে, - এ সব না জানিয়াই ভ্রমবশতঃ উহা শশাঙ্কের মুখে বসাইয়া দিয়া হুয়েন সাংয়ের উক্তিগুলি সমর্থন করিতে যত্নবান হইয়াছেন।"[৪]

এসকল মন্তব্য কতখানি যুক্তিযুক্ত এবং প্রাসঙ্গিক, আলোচ্য আখ্যায়িকায় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কাহিনির অন্তরালে তাই তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন।

আখ্যায়িকার শুরুতেই রাখালদাস দেখিয়েছেন, বৃদ্ধ ভট্ট আট বছরের বালক শশাঙ্ককে গুপ্তবংশ প্রতিষ্ঠার কাহিনি শোনাচ্ছেন। কাহিনির মধ্য দিয়ে বাল্যাবস্থা থেকেই শশাঙ্কের অন্তরে সদ্ধর্মীদের প্রতি বিদ্বেষের বীজ রোপণ করা হচ্ছে। আসলে, গুপ্তসম্রাটেরা ভাগবত মতাবলম্বী, অর্থাৎ বৈষ্ণব ছিলেন। আলোচ্য আখ্যায়িকায় শশাঙ্ককে গুপ্তবংশের ভাবী উত্তরাধিকারী হিসেবেই দেখানো হয়েছে। শশাঙ্কের শিলালিপিতে প্রাপ্ত বৃষের মূর্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, তিনি সম্ভবত শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু আলোচ্য আখ্যায়িকায় শশাঙ্কের পরিচয় দানপর্বে উল্লেখ করেছেন, -

> "পরমেশ্বর পরমবৈষ্ণব যুবরাজভট্টারক মহাকুমার শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তদেব।"[৫]

তাই, শশাঙ্কের মনে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণদের প্রতি প্রীতি উৎপাদন করার জন্য তাঁদের স্তুতি গাওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বৌদ্ধদের দুরাচারী প্রবৃত্তির দিকটিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উদঘাটিত করা হয়েছে, -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 243 - 254
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "চন্দ্রগুপ্তের নেতৃত্বে পাটলিপুত্রবাসিগণ শকগণকে পবিত্র মগধভূমি হইতে দূর করিয়া দিল। বিদ্রোহাগ্নি পাটলিপুত্র নগর হইতে মগধের চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, তীরভূক্তি ও মগধ বৌদ্ধের করকবলমুক্ত হইল। পাটলিপুত্রে জাহ্নবী সলিলে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হইল।...দেশে শান্তি স্থাপিত হইল।"[৬]

এবং -

> "বাসুদেবের চক্রধ্বজ ও মহাদেবের ত্রিশূলধ্বজ শোভিত মন্দিরসমূহ পুনরায় গগন স্পর্শ করিল।"[৭]

অর্থাৎ, পাটলিপুত্রে রাজশাসকের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সেখানের ধর্মীয় অবস্থান পরিবর্তনের নিবিড় সংযোগ রয়েছে। শকগণ পাটলিপুত্র থেকে বিতাড়িত হওয়ার ফলে বৌদ্ধদের প্রভাব মুক্ত হওয়ায় মগধ ও তীরভূক্তি অঞ্চলের রাজনৈতিক তথা সামাজিক পরিবেশও অশান্ত থেকে শান্ত হয়। অবশ্য এই রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমির বদল বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণদের জন্য যতখানি অনুকূল ছিল, বৌদ্ধদের জন্য ততখানি ছিল না। তবে, রাখালদাস কোনো ধর্মের প্রতি বিশেষ পক্ষপাত প্রদর্শন করেননি। তিনি নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে দেখিয়েছেন পূর্বে শকরাজগণের অধীনে সদ্ধর্মীরা যেমন ব্রাহ্মণদের নিপীড়ন করেছে, তেমনই বৈষ্ণব ধর্মানুরাগী চন্দ্রগুপ্তের সময় বৌদ্ধরাও খানিকটা কোণঠাসা বা একঘরে হয়েছে; অতএব, এ বিরোধ উভমুখী।

শশাঙ্কের শাসনাধীন সময়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশের বাতাবরণ বৌদ্ধদের পক্ষে কতখানি অনুকূল বা প্রতিকূল ছিল, তা বোঝা যায় আলোচ্য আখ্যায়িকায় প্রতিফলিত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনচর্যা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের গতিপ্রকৃতির মধ্যে দিয়ে। গৌতম বুদ্ধ অহিংসা ও মৈত্রীর দ্বারা তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তিনি এতটাই সাফল্য অর্জন করেছিলেন যে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের গণ্ডি অতিক্রম করে বহির্বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কিন্তু বুদ্ধের মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনাদর্শ, নীতি-নৈতিকতার মধ্যে বিস্তর ফারাক পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবর্তনের পশ্চাতে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে রয়েছে, তা হল - জনসংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ধর্মের বিস্তার। কিন্তু ধর্মের প্রসার করার ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে অহিংসাকে জীবন-সর্বস্ব করে তুলেছিল। আখ্যায়িকার শুরুতে বৃদ্ধ ভট্ট গল্পের ছলে বালক শশাঙ্কের অন্তরে সদ্ধর্মীদের প্রতি বিদ্বেষের যে বীজ বপন করেছিলেন, বাল্যাবস্থায় শশাঙ্ক তার ভয়াবহতা অনুভব করতে পারেন। বৃদ্ধ ভিক্ষু বজ্রাচার্য ওরফে শক্রসেন বজ্র দ্বারা শশাঙ্কের প্রাণনাশের প্রচেষ্টা করেন, -

> "তুমি আমার শত্রু, তুমি আমার ধর্মের শত্রু, আমার ইচ্ছা করিতেছে তোমার হৃৎপিণ্ডটা কাটিয়া লইয়া তোমার বুকের রক্ত শুষিয়া খাই।"[৮]

বাল্যাবস্থায় শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিরোধী কার্যকলাপের প্রামাণিক ভিত্তি না থাকা সত্ত্বেও, শুধুমাত্র গণনার মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়েছে শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেন। তাই, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাঁদের ধর্মের শত্রুর অস্তিত্ব বিলোপ করার ছক কষতে থাকে। বজ্রাচার্য এই হত্যাকার্যে সফলতা লাভ না করায় আবার বন্ধুগুপ্ত নামের অপর বৌদ্ধভিক্ষু কর্তৃক তিরস্কৃতও হন, -

> "বজ্রাচার্য! তোমার এ কলঙ্ক লুকাইবার স্থান পাইবে না, যুগের পর যুগ চিরকাল যাবৎ বৌদ্ধ জগতে তোমার কলঙ্ককাহিনী ঘোষিত হইবে।"[৯]

নরহত্যা করে বন্ধুগুপ্ত পাষাণ হয়ে গেছে, তাঁর অন্তরের কোমল প্রবৃত্তিগুলি লোপ পেয়েছে, তাই নরবলিতে ব্যর্থ বজ্রাচার্যকে অকপটে তিনি ভর্ৎসনা করতে পারেন। বৌদ্ধধর্ম বা হিন্দু ধর্ম নয়, সবার ওপরে যে ধর্মের অবস্থান তা হল মানব ধর্ম। মানব ধর্মের নিরিখে বিচার করলে বন্ধুগুপ্তের জীবনের অধ্যায় আরও কলঙ্কিত। গুপ্তবংশের মহানায়ক যশোধবলদেবের পুত্র কীর্তিধবলকে তিনি কেন হত্যা করেন, তার যুক্তিও তাঁর কাছে সাজানো, -

> "আমি তখন বঙ্গদেশে, কিন্তু সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও আমি সদ্ধর্মিগণকে কীর্তিধবলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে পারলাম না। তখন ভাবিয়া দেখিলাম যে, যশোধবলের পুত্রের নিধন ব্যতীত সঙ্ঘের কার্য সিদ্ধির আর কোনও উপায় নাই।"[১০]

এই নারকীয় হত্যার বিবরণ যে কোনো সুস্থ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে বীভৎস ও বিকৃত ঠেকলেও বন্ধুগুপ্তের কাছে তা গর্বের বিষয়। তাই, অবলীলায় বন্ধুগুপ্ত বজ্রাচার্যের কাছে এই হত্যার বর্ণনা দান করতে পারেন, -

> "অন্ধকারে তাহার অনুচরবর্গ যখন তাহাকে অনুসন্ধান করিতেছে তখন তাহার নিকটে গিয়া দেখিলাম সে তখনও জীবিত আছে এবং তাহার আঘাত সাংঘাতিক নহে। মন্দির হইতে প্রতিমার হস্তের খড়্গ লইয়া তাহার হস্তের ও পদের ধমনীগুলি কর্তন করিলাম। যন্ত্রণায় তাহার জ্ঞানোদয় হইল, দারুণ যন্ত্রণায় ও রক্তস্রাবে ক্ষীণকণ্ঠে বারংবার জল চাহিল। রুধির দর্শনে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আমি তাহার কর্ণপাত করি নাই, এইরূপে মহাশত্রু নিপাত হইল।"[১১]

'প্রতিমোক্ষ' নামক গ্রন্থে ভিক্ষুগণ কর্তৃক পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, কোনো ভিক্ষু নরহত্যা, ব্যভিচারের মতো পাপকর্মে লিপ্ত হলে, তিনি পারাজিক ধর্ম পালন করছেন না এবং তাঁকে সংঘ থেকে বহিষ্কার করা হবে। আলোচ্য আখ্যায়িকায় দেখা যায়, ভিক্ষুগণ পাপকার্যে লিপ্ত হলে অন্যান্য ভিক্ষুরা তাঁকে ইন্ধন জোগাচ্ছেন। যেমন - বন্ধুগুপ্ত কীর্তিধবলকে হত্যা করলে, কপোতিক সংঘারামের বুদ্ধমিত্র এবং মহাবোধি বিহারের বিহারস্বামী জিনেন্দ্রবুদ্ধি ও সংঘস্থবির বন্ধুগুপ্ত তাঁকে আশ্রয় দান করেন এবং শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য নানা রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

বজ্রাচার্য, বন্ধুগুপ্ত এবং বুদ্ধমিত্র এইসকল বৌদ্ধভিক্ষু সমগ্র উত্তরাপথের বৌদ্ধসংঘের কাণ্ডারি। আলোচ্য আখ্যায়িকায় প্রতিফলিত এই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কার্যাবলী ন্যায়-নীতিবোধ দ্বারা পরিচালিত হত না, তা নিয়ন্ত্রিত হত অদৃষ্ট ও কর্মফল দ্বারা। এঁরা প্রত্যেকেই গণনাকার্যে সিদ্ধহস্ত। কারণ কাহিনি যত অগ্রসর হতে থাকে ভিক্ষুদের গণনা ততই অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। ভিক্ষু বজ্রাচার্য শশাঙ্ককে হত্যা করতে গিয়েও ফিরে আসেন। কারণ তিনি ভাগ্যচক্রের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। আবার, বন্ধুগুপ্ত কীর্তিধবলকে হত্যা করে নিশ্চিন্তে দিন অতিবাহিত করতে পারেন না। কারণ, গণনার দ্বারা তিনিও জানতে পেরেছন, তাঁর হন্তারক কীর্তিধবলের পিতা যশোধবলদেব কুড়ি বছর পর পাটলিপুত্র নগরে পুনরায় ফিরে এসেছেন। বৌদ্ধরা ক্ষণিকবাদী, তাঁরা বিশ্বাস করেন প্রত্যেক বস্তু তথা মানুষ মুহূর্তে পরিবর্তনের মাধ্যমে রূপান্তরিত বা ধর্মান্তরিত হয়ে যায়। বজ্রাচর্যের ওপর বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদ প্রভাব বিস্তার করায়, তিনি নিজেকে অমানবিক বা ন্যায় নীতিবিরুদ্ধ কাজ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পেরেছিলেন। যে বজ্রাচার্য বালক শশাঙ্ককে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, সেই বজ্রাচার্যই আবার বন্ধুগুপ্তর শূলে বিদ্ধ হয়ে জলে পতিত শশাঙ্ককে উদ্ধার করে নবজীবন সঞ্চার করেন - এ তো বজ্রাচার্যের রূপান্তরের সাক্ষ্য বহন করে। কর্মের মাধ্যমে যে জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি ঘটে তা বজ্রাচার্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই, তিনি চরিত্র শুদ্ধির দ্বারা আত্মিক উন্নতি করতে পেরেছিলেন। বৌদ্ধ কর্মবাদ প্রসঙ্গে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের মন্তব্য বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য—

> "তৃষ্ণাত্যাগে অকুশল কর্মবিরহিত হইতে পারিলেই জন্মবন্ধনের হাত হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। এই সম্যক্ দৃষ্টি বা প্রজ্ঞা একবার লাভ করিতে পারিলে তাহার পরে করুণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যে সর্বজনহিতে কুশলকর্ম তাহা আর চিত্তে সংস্কার সৃষ্টি করিয়া বন্ধনের কারণ হয় না, এবং এই জন্যই বোধিসত্ত্বগণের যে কুশলকর্ম তাহা কখনই তাঁহাদের বন্ধনের কারণ হয় না।"[১২]

আলোচ্য আখ্যায়িকায় একদিকে বজ্রাচার্য এবং অন্যদিকে বন্ধুগুপ্ত, বুদ্ধশ্রী ও জিনেন্দ্রবুদ্ধি এইসকল বৌদ্ধ ভিক্ষুর পরিণতির মধ্য দিয়ে রাখালদাস বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বজ্রাচার্যের রূপান্তর যেহেতু সদর্থক, তাই শশাঙ্ক তাঁকে কপোতিক মহাবিহারের ভার অর্পণ করতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে, কাহিনির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বন্ধুগুপ্ত ছলনা, কপটতাকে আশ্রয় করায়, তাঁকে নিহত হতে হয় যশোধবলের হাতে। 'মিলিন্দ-পঞ্হো' বৌদ্ধদর্শনের অন্যতম আকর

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 243 - 254
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গ্রন্থ। সেখানে রাজা মিলিন্দের প্রশ্নে ভদন্ত নাগসেন উত্তর করছেন, "অনুবন্ধেষ্যুৎ খো মহারাজ, তানি কম্মানি ছায়া'ব অনপায়িনী'তি।" - অর্থাৎ

"সেই কর্মসমূহ অনপায়িনী (অপরত্যাগিনী) ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করে।"[১৩]

যাঁরা অকুশল, পাপাচার এবং অধর্মকে জীবনের সারাৎসার বলে মনে করেন, তাঁরা জন্মবন্ধনের হাত থেকে নিবৃত্তি তো লাভ করেন না, এমনকি তাঁদের জীবনের অন্তিম পরিণতি সুখকরও হয় না।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আখ্যায়িকায় মগধের গুপ্তবংশের সাথে কামরূপের ভগদত্তবংশের যে বিরোধিতা কিংবা মেঘনাদের যুদ্ধে ও শঙ্করনাদের যুদ্ধে সম্মুখ সমরের যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভূমিকা একেবারে নীরব ছিল না। বিশেষ করে, বন্ধুগুপ্ত এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও অন্তরালে থেকে কলকাঠি নাড়িয়েছেন। এই সকল শ্রমণদের এক অংশ মগধের পার্শ্ববর্তী স্থানের সংঘারামের স্থবির হওয়া সত্ত্বেও, তাঁরা মগধের বৈষ্ণব রাজার প্রভুত্ব স্বীকার করেন না। নিজেদের প্রদেশের গণ্ডি অতিক্রম করে থানেশ্বরের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজা প্রভাকরবর্ধনকেই দেশের প্রকৃত শাসকের সম্মান ও মর্যাদা দেন। অতএব, এই যুদ্ধ চলাকালীন বন্ধুগুপ্ত, বুদ্ধশ্রী ও জিনেন্দ্রবুদ্ধির মতো বৌদ্ধাচার্যগণ নিজেরা যে শুধুমাত্র দেশদ্রোহী হয়ে ওঠেন এমন নয়, মেঘনাদের পূর্ব ও পশ্চিম তীরবর্তী বৌদ্ধ সামন্তরাজগণের অধীনস্থ প্রজাদেরও দেশদ্রোহী হয়ে ওঠার মন্ত্রনা দেন। সামন্তরাজগণের অধীনস্থ বৌদ্ধ প্রজাদের ওপর এই সকল শ্রমণরা এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে প্রজারা সামন্তরাজাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পক্ষ অবলম্বন করেন।

"বৌদ্ধদের ঐহিক জীবনে অংশগ্রহণ করার, বিশেষ করিয়া ভিন্নদেশের রাজার পক্ষ গ্রহণ করিয়া স্বদেশের বিরোধিতা করার আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইউরোপীয় ইতিহাসে ধর্মযাজকেরা এই জাতীয় কাজে লিপ্ত হইয়াছেন এইরূপ অভিযোগ আছে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া প্রস্তুত বিষয়ে ফিরিয়া আসিব। হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বেশ কিছুকাল পরে বিন কাশিম যখন রাজা দাহিরকে পরাজিত করিয়া সিন্ধুদেশে মুসলমান অধিকার পত্তন করেন তখন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা স্বদেশের রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।"[১৪]

শঙ্করনদের যুদ্ধে বীরেন্দ্রসিংহ কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার শিবিরে কৌটোর মধ্যে থেকে সংঘস্থবির বন্ধুগুপ্ত এবং কপোতিক মহাবিহারের মহাস্থবির বুদ্ধঘোষের দুটি পত্র উদ্ধার করেন। পত্রের বিষয় উল্লেখ করলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দেশদ্রোহীতার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের সামনে উদঘাটিত হয়। বন্ধুগুপ্তের পত্র, -

"যদি কোন উপায়ে শশাঙ্ককে হত্যা করিতে পারেন তাহা হইলে যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবে এবং যশোধবল আমাদিগের হাত এড়াইয়া দেশে ফিরিতে পারিবে না।"[১৫]

বুদ্ধঘোষের পত্র—

"এখন পাটলিপুত্রে দুই তিন সহস্রের অধিক সুশিক্ষিত সেনা নাই। আপনি যদি যুবরাজকে পরাজিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পাটলিপুত্র আক্রমণ করিবেন। চরণাদ্রি পারে স্থান্বীশ্বরের সেনা প্রস্তুত আছে।"[১৬]

প্রাপ্ত চিঠি দুটির মাধ্যমে দুটি বিষয় আমাদের স্পষ্ট হল। (ক) থানেশ্বরের বৌদ্ধ রাজারা অন্তরালে থেকে মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভাস্করবর্মাকে সহায়তা করছেন। কারণ, থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের মাতুল মহাসেনগুপ্ত যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন তিনি প্রকাশ্যে গুপ্তবংশের বিরোধিতা করবেন না। (খ) বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শত্রু কেবল অবৌদ্ধ রাজা শশাঙ্ক নন, গুপ্তবংশের প্রতাপশালী মহানায়ক যশোধবলদেবও, তাই তাঁকে অবরুদ্ধ করে তাঁর ক্ষমতা কেড়ে নিতে চান। কারণ—

"এই কাহিনীতে যশোধবলের কার্যকলাপ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তিনি বৌদ্ধবিরোধী। যশোধবল ক্ষমতায় আসিলে বৌদ্ধদের প্রভাব সীমিত হইবে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য বৌদ্ধগণ না করিতে পারে এমন কাজ নাই এই কথা তিনি বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়বার তিনি যখন সাম্রাজ্যের হাল

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 243 - 254
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> ধরিলেন তখন মহাস্থবির বুদ্ধঘোষ ক্ষোভের সহিত বলিয়াছেন যে সম্রাটের প্রাসাদের কোন সংবাদই তাঁহারা আর সংগ্রহ করিতে পারেন না।"[১৭]

অতএব, আখ্যায়িকায় প্রতিফলিত যে সকল বৌদ্ধ ভিক্ষুর পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁরা ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে রাজনীতিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। সমস্ত সাম্রাজ্য বিরোধী শূন্য করার জন্য তাঁরা নরহত্যা করতেও প্রস্তত। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্যই হল আর্যাবর্তে একচ্ছত্র বৌদ্ধরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁরা সৎ কিংবা অসৎ পথ নির্বাচন করলেন কিনা, তা তাঁদের বিবেচ্য নয়।

ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত এক প্রশ্ন হল - শশাঙ্ক কি বৌদ্ধ বিরোধী ছিলেন? ইতিহাসে শশাঙ্কর চরিত্রকে একপাক্ষিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানো হয়েছে, তাই তার মূল্যায়নও সরলরৈখিক। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আখ্যায়িকায় শশাঙ্ক ও বৌদ্ধ ভিক্ষু উভয়ের নানা কর্মকাণ্ড ও পদক্ষেপ পাঠকের সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে শশাঙ্ক চরিত্রটি পুনর্মূল্যায়নের অবকাশ তৈরি করেছেন। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রাখালদাসের অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়েছে। তাই, শশাঙ্কের ওপর আরোপিত দোষ খণ্ডন করে, তাঁকে কলঙ্কমুক্ত করতে তিনি পাল্টা যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। অন্যদিকে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনচর্যা, আদর্শকে কালিমালিপ্ত করে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়েছেন।

প্রথমত, আখ্যায়িকায় দেখানো হয়েছে, শশাঙ্কের শাসানাধীন সময়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু কিংবা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের সমাজে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। শুধু তাই নয়, ভিক্ষুদের ক্ষমতার অপপ্রয়োগেরও দৃষ্টান্ত রয়েছে। বৌদ্ধ সংঘে অবরুদ্ধ শ্রেষ্ঠী বসুমিত্র ওরফে বৌদ্ধ ভিক্ষু জিনানন্দকে তরলা যখন মুক্ত করে, তখন বসুমিত্রের নিরাপত্তা নিয়ে তরলা আশঙ্কা প্রকাশ করে—

> "দিবালোকে, প্রকাশ্য রাজপথে, দেখিতে পাইলে, ভিক্ষুগণ মঠে লইয়া গিয়া আমাদিগকে হত্যা করিবে। নগর এখনও বৌদ্ধ-প্রধান, রাজধানীতে এমন কেহ নাই যে আমাদিগকে ভিক্ষুগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে।"[১৮]

শশাঙ্কের সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম রাজপৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি, একথা সত্য। তথাপি, একথাও নিঃসন্দেহে বলা যায়, শশাঙ্ক সরাসরি বৌদ্ধদের বিরোধিতা করেননি। বরং, তাঁর সময়ে বৌদ্ধরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। শশাঙ্কের সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থান তলানিতে গিয়ে যে ঠেকেনি, ইতিহাসেও তার সমর্থন মেলে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হিউয়েন সাঙ যখন মগধ থেকে বাংলায় আসেন, তখন পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্ত বাংলার চারভাগে তিনি ৭০ টিরও অধিক বৌদ্ধ সংঘারাম দেখেছিলেন। এইসকল সঙঘারামে তখন ৮০০০ জন ভিক্ষু অবস্থান করতেন। এই পরিসংখ্যান যে নিতান্ত অমূলক নয়, তা নীহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্যেও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, -

> "খুব কিছু অনিষ্ট যে করিতে পারেন নাই তাহা তো য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ ও ইৎ-সিঙের বিবরণীতেই সুস্পষ্ট। তাহা হইলে শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে য়ুয়ান্-চোয়াঙ্ এবং ৫০ বৎসর পরে ইৎ-সিং বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্মের এতটা সমৃদ্ধি দেখিতে পাইতেন না।"[১৯]

দ্বিতীয়ত, শশাঙ্ক রাজা হলেও, ধর্মীয় অবস্থানগত দিক দিয়ে বৌদ্ধ না হওয়ায় তাঁর রাজ্যের বৌদ্ধভিক্ষুরা প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতা করতেন। এই বিরুদ্ধাচরণের মানদণ্ড হল ধর্মীয় পরিচয়গত ব্যবধান। তাই, মহাস্থবির বুদ্ধঘোষের রাজদ্রোহপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলে, মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করেন—

> "যে ব্যক্তি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নহে, বৌদ্ধগণ তাহাকে কখনও রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না এবং সেই ব্যক্তিকে পদচ্যুত অথবা হত্যা করিতে পারিলে পাপ নাই, মহাপুণ্য।" [২০]

বলাবাহুল্য, বৌদ্ধাচার্যগণ সদ্ধর্মীদেরও অ-বৌদ্ধ রাজার প্রভুত্ব স্বীকার না করার পাঠদান দিতেন। এর মাধ্যমে তাঁরা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ইন্ধন জোগাতেন।

তৃতীয়ত, বৌদ্ধভিক্ষুরা শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার প্রয়াস চালাতেন। এই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে কেউ গুপ্তচর বা গুপ্তঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। গুপ্তচরের ছদ্মবেশে শশাঙ্ককে হত্যা করার নানা চক্রান্তের দৃষ্টান্ত উপন্যাসে রয়েছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু ওরফে গুপ্তঘাতকের আক্রমণ থেকে শশাঙ্ককে রক্ষা করতে মহাপ্রতীহার বিনয়সেন

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 243 - 254
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন। শেষপর্যন্ত শশাঙ্ক কোনো স্ত্রীলোকের সাথে সাক্ষাতের সময় আত্মরক্ষার্থে হাতে অসি রাখতেন। কারণ, সেই ছদ্মবেশী স্ত্রীলোকের মুণ্ডিতশির বৌদ্ধ ভিক্ষু হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। বৌদ্ধ ভিক্ষু বুদ্ধশ্রী একজন গুপ্তচর, যিনি দুই বছর কপোতিক সংঘারামের মহাস্থবির বুদ্ধঘোষের আশ্রয়ে বাস করেছেন। তিনি ছদ্মবেশে নগর পরিত্যাগ করার সময় পথে ধৃত হওয়ায় দুইজনকে আহতও করেন। এই বৌদ্ধ ভিক্ষু ওরফে গুপ্তচরকে যশোধবলদেব প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার ইচ্ছা শশাঙ্কের সামনে প্রকাশ করলে, শশাঙ্ক বুদ্ধশ্রীকে কারারুদ্ধ করে রাখাই সমীচীন বলে মনে করেন—

> "যশোধবল এখনও বহু নরহত্যা করিতে হইবে, নিরর্থক প্রাণীহত্যায় লাভ কি?"[২১]

বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্ম উভয় ধর্মে প্রাণী হত্যা নিন্দনীয়। শশাঙ্ক ক্ষত্রিয় তথা শাসক হয়েও নরহত্যা থেকে বিরত থেকে বৈষ্ণব ধর্ম রক্ষা করলেন। অন্যদিকে, এই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংঘের স্বার্থে আঘাত লাগলে, তাঁরা ধর্মীয় আদর্শ বিস্মৃত হয়ে রক্তে রঞ্জিত করতেও পিছুপা হন না।

চতুর্থত, চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর বিবরণী থেকে জানা যায়, শশাঙ্ক গয়ার বোধিবৃক্ষ কেটে ফেলেন এবং মন্দির থেকে বুদ্ধমূর্তি সরিয়ে শিবমূর্তি প্রতিস্থাপন করেন। রাখালদাসের কাছে এরূপ বিরূপ মন্তব্য ভিত্তিহীন বলে মনে হয়েছে। তাই, আলোচ্য আখ্যায়িকায় তিনি দেখিয়েছেন, শশাঙ্ক বোধিবৃক্ষ কেটে ফেলার নির্দেশ দেন, কিন্তু তা যে তাঁর বৌদ্ধ বিরোধী মানসিকতার ফসল, তা বললে শশাঙ্কের প্রতি অবিচার করা হবে। কীর্তিধবলের হন্তারক বৌদ্ধ ভিক্ষু বন্ধুগুপ্ত আত্মরক্ষার্থে বোধিবৃক্ষের তলদেশের এক সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে পলায়ন করলে তাঁর অনুসন্ধানের জন্য শশাঙ্ক বোধিবৃক্ষ কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। বন্ধুগুপ্ত সমাজ তথা রাষ্ট্রের চোখে একজন অপরাধী, রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের জন্য ধর্মীয়বেড়া ভেঙেও যদি তাঁকে হত্যা করা হয়, তাতে রাজধর্ম লাঞ্ছিত হয় না। রাখালদাস লিখেছেন—

> "সম্রাট কয়েকজন সৈনিককে বোধিবৃক্ষ কর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন। ভিক্ষুগণের রোদন ধ্বনির মধ্যে প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষের শাখা প্রশাখা ছিন্ন হইল, বৃক্ষকাণ্ডও সমূলে উৎপাটিত হইল, বজ্রাসনের গুরুভার পাষাণখণ্ড স্থানচ্যুত হইল। ভূগর্ভে দীর্ঘ রন্ধ্রপথ আবিস্কৃত হইল, কিন্তু বন্ধুগুপ্তকে দেখিতে পাওয়া গেল না। দিনান্তে সুড়ঙ্গের শেষভাগে লৌহদ্বার যখন ভঙ্গ হইল, বন্ধুগুপ্ত তখন বহুদূরে গগনস্পর্শী ত্রিচূড় কুক্কুটপাদগিরির নিকটে। শশাঙ্ক ও যশোধবলদেব বিফলমনোরথ হইয়া পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করিলেন।"[২২]

এই ঘটনার পর বৌদ্ধানুরাগী হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালালেও তিনি যে সফলতা লাভ করতে পারেননি, ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করে। উক্ত ঘটনার ২৪ বছর পর, হিউয়েন সাং নানা কল্পকাহিনি উপস্থাপন করে শশাঙ্ককে অপরাধী সাব্যস্ত করার বিশেষ প্রয়াস করেছেন এবং অদ্ভুত রূপকথার আশ্রয়ে বৌদ্ধধর্মের পুনরুত্থানের বর্ণনা দিয়েছেন। রাখালদাস লিখেছেন, -

> "অবশেষে, অশোকের বংশধর পূর্ণবর্মার ভক্তি ও যত্নে, এক রাত্রির মধ্যে পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। খণ্ডীকৃত, সমূলে উৎপাটিত মহীরুহ কিরূপে একরাত্রির মধ্যে যষ্টি হস্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার বর্ণনা এই আখ্যায়িকার বিষয়ভূত নহে, কিন্তু সরল ধর্মপ্রাণ চৈনিক পরিব্রাজক বিশ্বস্তচিত্তে এই কাহিনী তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।"[২৩]

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন, শশাঙ্ক প্রত্যক্ষভাবে বৌদ্ধদের নির্যাতন করেননি। কিন্তু, তাঁর রাজ্যর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শশাঙ্কের প্রতি সদয় ছিলেন না। কারণ, অবৌদ্ধ রাজা সাম্রাজ্যের অধিপতি হলে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের স্বার্থসিদ্ধির পথ ব্যাহত হবে। তাই, বন্ধুগুপ্ত মেঘনাদের যুদ্ধে শশাঙ্ককে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করার প্রচেষ্টা করেন। বলাবাহুল্য, বিভিন্ন বৌদ্ধ ভিক্ষু শশাঙ্ককে রাজনীতির মঞ্চ তথা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তা সফল হয়নি। রাখালদাস ইতিহাসের উপেক্ষিত এই নায়ককে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হাতে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেননি; শশাঙ্ক ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বীরের মতো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। তবে, বন্ধুগুপ্তের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে না হলেও, প্রাথমিকভাবে কার্যকর হয়েছিল। কারণ, মেঘনাদের যুদ্ধের পর শশাঙ্কের অন্তর্ধান ঘটেছিল। শশাঙ্কের অনুপস্থিতিতে তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধবগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। মাধবগুপ্ত সম্রাট হিসেবে যেমন অযোগ্য, তেমনই তাঁর ক্ষমতাও সীমিত। তিনি নিজ সাম্রাজ্যের হিতকারী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 243 - 254
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মহানায়ক যশোধবলদেব ও অভিজাত সম্প্রদায়কে অবজ্ঞা ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান করে থানেশ্বরের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পুষ্যভূতি বংশের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করেন। বলাবাহুল্য, মগধের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এমন সুযোগের জন্য ওত পেতে ছিল। তাই—

> "বুদ্ধঘোষ, বন্ধুগুপ্ত প্রভৃতি বৌদ্ধ সংঘের নেতাগণ প্রকাশ্যে ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল, তাহাদিগের অত্যাচারে পাটলিপুত্রের নাগরিকগণ অস্থির হইয়া উঠিল। শত শত দেবমন্দিরের ভূসম্পত্তি অপহৃত হইল, সহস্র সহস্র মন্দিরে মহাদেব ও বাসুদেবের পরিবর্তে বৌদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, অত্যাচার-প্রপীড়িত প্রজাবৃন্দ মহানায়কের শরণাপন্ন হইল। কিন্তু মহানায়ক তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলেন না।"[২৪]

মহাসেনগুপ্ত কিংবা তাঁর পুত্র শশাঙ্ক সিংহাসনে থাকাকালীন অকারণে বৌদ্ধ জনসাধারণ, বৌদ্ধ ভিক্ষু কিংবা বৌদ্ধ ধর্মের মর্যাদাহানি করেছেন উপন্যাস জুড়ে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সাম্রাজ্যের দুর্দিনে বৌদ্ধ সংঘের কর্মকর্তাদের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি অতর্কিত আক্রমণ, তাঁদের ধর্মীয় উদারতা নয়, ধর্মান্ধতারই পরিচয় বহন করে। ফলে, আখ্যায়িকার শেষে শশাঙ্ক যখন সিংহাসন আরোহন করেন, তখন তিনি পরধর্মদ্বেষী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ক্ষমতা কেড়ে নেন। তাই, উপন্যাসের শেষে বজ্রাচার্য ওরফে শক্রসেন ছাড়া অন্যান্য বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিণতি ভয়াবহ। এভাবেই, শশাঙ্ক দুর্নীতিপরায়ন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কর্তৃত্ব প্রতিহত করে উত্তরাপথের বৌদ্ধ ভিক্ষু তথা বৌদ্ধ সংঘের প্রাধান্য নিষ্ক্রিয় করেন। শশাঙ্কের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কর্তৃত্বহীন করে তোলার পদক্ষেপের ফলে, তাঁকে পরধর্মদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করা যায় না। কারণ, শশাঙ্ক সকল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতি এরূপ আচরণ করেননি, তার প্রমাণ শক্রসেন। এইসকল পদলোভী ভিক্ষুরা আসলে রাষ্ট্রদ্রোহী। তাই একজন শাসক হিসেবে রাষ্ট্রের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য শশাঙ্ক রাষ্ট্রদ্রোহীদের দমন করেছেন। শশাঙ্ক বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রভাব সীমিত করেছেন তাঁদেরই কৃতকর্মের কারণে, তাঁদের ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে নয়।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উপন্যাসগুলিতে হিন্দু বৌদ্ধ যুগের চালচিত্র উদঘাটিত হয়েছে, সেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবনমন ও অবক্ষয়িত রূপটি প্রকট হয়ে উঠেছে। এখানে ঔপন্যাসিক হিসেবে রাখালদাস নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর পক্ষপাতদুষ্টতা সম্পর্কে প্রতাপচন্দ্র চন্দের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে, -

> "সর্বকালেই রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের একটা সম্বন্ধ আছে। কিন্তু রাখালদাসের কিছু উপন্যাসে এই ধর্মবিদ্বেষের চিত্র যেন বেশি করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেটা আমার মতে অসমীচীন।"[২৫]

হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পারস্পরিক ধর্মীয় সংঘাতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্মান্ধতার ধারক ও বাহক হিসেবে প্রতিপন্ন করার পশ্চাতে রাখালদাসের ক্ষেত্রে যে কারণগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তা হল —

প্রথমত, রাখালদাস বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত পাঠ গ্রহণ করেন তাঁরই শিক্ষাগুরু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাছ থেকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ছিল। তার প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে 'কাঞ্চনমালা' ও 'বেণের মেয়ে' উপন্যাস দুটির কথা। বঙ্গদেশ থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সমূলে উচ্ছেদকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁদেরই কৃতকর্মের যথোপযুক্ত ফল হিসেবে দেখেছেন—

> "এক একবার মনে হয় তিন চারি শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরা ইন্দ্রয়াসক্ত, কুকর্ম্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক হইয়া যে নিজেও অধঃপাতে গিয়াছিল এবং দেশটাকে সুদ্ধ অধঃপাতে দিয়াছিল, মুসলমানদের আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। বিধাতা যেন তাহাদের পাপের ভরা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মুসলমানদের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের সেই ঘৃণিত উপাসনা, বিষ্ঠামূত্র ভক্ষণ করিয়া সিদ্ধিলাভের চেষ্টা, ভূতপ্রেত পূজা করিয়া বুজরুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তিকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করা ও তাহাই শিখান- এই সকলের পরিণামে তাহাদিগকে বঙ্গদেশ চিরকালের জন্য ছাড়িতে হইল।"[২৬]

কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা ছাড়াই, শিষ্য হিসেবে রাখালদাস বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্পর্কিত গুরুর দীক্ষাকে অবিকল গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে, হরপ্রসাদ কিংবা রাখালদাস কেউ-ই মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে পারেননি।

দ্বিতীয়ত, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রতি রাখালদাসের যে দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর উপন্যাসগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে, তা তাঁর জাতীয়তাবাদী চেতনার ফসল। তাই, শশাঙ্ক, ধর্মপাল কিংবা স্কন্দগুপ্তকে পৌরুষের পরকাষ্ঠা হিসেবে দেখানো হয়েছে। এইসকল হিন্দুকুলপতিদের বীরগাথা, অমিত পরাক্রমশীলতার কাহিনি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে হিন্দু জাত্যাভিমানকে তুলে ধরার এক সচেতন প্রবণতা তাঁর উপন্যাসগুলিতে লক্ষ করা যায়। এই সকল দেশনায়কদের জীবন, আদর্শ, দেশপ্রেম এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে দেশের স্বার্থে আত্মবলিদান সাধারণ মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন আত্মবিশ্বাস গঠনে সহায়ক হয়েছিল, অন্যদিকে তাঁদের অন্তরে জাতীয়তাবোধের বীজও রোপণ করেছিলো। তাই, হিন্দু ঐতিহ্য ও আদর্শের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে সচেতনভাবে আলোকিত করতে গিয়ে রাখালদাস বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনচর্যা ও আদর্শকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

Reference:

১. রায়, যোগীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), মানসী ও মর্মবাণী, মানসী প্রেস, কলিকাতা, ১৩২৫, পৃ. ৩১৮
২. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১৩, পরিবর্তিত চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৭৩, পৃ. ২৫
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, মনমোহন প্রকাশনী, কলিকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬০, পৃ. ৭৯
৪. দাশগুপ্ত, নলিনীনাথ, গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর যুগ, বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, তথাগত, কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ-১৪২৬, পৃ. ৫৭
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, শশাঙ্ক, বইদেশিক, কলকাতা - ৪৯, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর- ২০২৩, পৃ. ৯৬
৬. তদেব, পৃ. ৩২
৭. তদেব, পৃ. ৩৩
৮. তদেব, পৃ. ৭৫
৯. তদেব, পৃ. ৮৫
১০. তদেব, পৃ. ১২১
১১. তদেব, পৃ. ১২১
১২. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ, বৌদ্ধ কর্মবাদ, বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা-৭৩, পঞ্চম মুদ্রণ, ১লা বৈশাখ, ১৪২৬, পৃ. ১৬
১৩. তদেব, পৃ. ১৫
১৪. সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র, শশাঙ্ক, শতবর্ষের আলোয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, শশাঙ্ক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪
১৬. তদেব, পৃ. ২০৪
১৭. সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র, শশাঙ্ক, শতবর্ষের আলোয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪
১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, শশাঙ্ক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪
১৯. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, অষ্টম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২০, প. ৩৭৫
২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, শশাঙ্ক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯
২১. তদেব, পৃ. ১৭৭
২২. তদেব, পৃ. ২৬৭

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 29
Website: https://tirj.org.in, Page No. 243 - 254
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২৩. তদেব, পৃ. ২৬৮

২৪. তদেব, পৃ. ২৪৫

২৫. সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র, শশাঙ্ক, শতবর্ষের আলোয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

২৬. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, বৌদ্ধ ধর্মের অধঃপাত, বৌদ্ধ ধর্ম, পূর্ব্বাশা লিমিটেড, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৫৫, পৃ. ৮৭